যুগান্তর

তারিখ ..13 JUN 2016...
পৃষ্ঠা ..৬.. কলাম..৭..

শিক্ষা খাতে বাজেট বৃদ্ধি শিক্ষার মানোন্নয়ন নির্দেশ করে না

খোলা জানালা

তারেক শামসুর রেহমান

শিক্ষা খাতে সরকার বাজেট বৃদ্ধি করেছে। গত দশ বছরের মধ্যে এটা সর্বোচ্চ। কিন্তু এ বাজেট বৃদ্ধি কি আদৌ শিক্ষার মানোন্নয়নে কোনো অবদান রাখতে পারবে? বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে এ বাজেট বৃদ্ধির প্রভাব কী? এখানে আমাদের নীতিনির্ধারকদের একটা বড় সমস্যা— তারা মনে করেন প্রতি জেলায় একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে কিংবা হাজার হাজার জিপিএ-৫ 'পাইয়ে' দিয়ে তারা মনে করেন তারা উচ্চশিক্ষায় একটি 'বিপ্লব' আনতে যাচ্ছেন! কিন্তু এটা একটি ভুল ধারণা। এভাবে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন করা যায় না। অতি সম্প্রতি একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল তরুণ প্রজন্মের কয়েকজন ছাত্রের একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। এরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং সবাই জিপিএ-৫-এর অধিকারী। সাক্ষাৎকারে তাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। তারা যেসব জবাব দিয়েছে, তা এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরছে। এ নিয়ে আলোচনা করা অর্থহীন। শিক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষ করে জিপিএ-৫ নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা আজ কোন্ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, ওইসব ছাত্রছাত্রীর জবাবের মধ্য দিয়ে তা প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ আমরা মানসর্বস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারিনি। আমাদের 'সমাজতান্ত্রিক' শিক্ষামন্ত্রী জিপিএ-৫ নিয়ে গর্ব করেন। এখন ছাত্রছাত্রীদের ওই বক্তব্য তাকে কতটুকু গৌরবান্বিত করতে পারবে, আমি জানি না। কিন্তু আমি এটা বুঝি, তরুণ প্রজন্ম আমাদের ভরসার স্থল, তারা আমাদের আশা ভঙ্গ করেছে। এ প্রজন্মকে নিয়ে আমি আশাবাদী হতে পারছি না। বিভিন্ন 'কোটায়' যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে, তারা একটি দক্ষ জনশক্তি কি আদৌ গড়ে তুলতে পারবে? তাই ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে যখন শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে ৫২ হাজার ৯১৪ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়, তাতে করে শিক্ষার মানোন্নয়নে তা কতটুকু অবদান রাখবে, এ প্রশ্ন থাকলই। তরুণ প্রজন্ম আমাদের 'শক্তি'। কিন্তু এই 'শক্তি'কে দক্ষ জনশক্তিতে আমরা পরিণত করতে পারিনি। শিক্ষক হিসেবে এ ব্যর্থতা আমারও। কীভাবে একটি দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা যায়, সিঙ্গাপুর আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত। চীনের দৃষ্টান্তও আমরা দিতে পারি। আমাদের বড় ব্যর্থতা এখানেই যে আমরা এ বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিয়েছি কম। শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়িয়েছে সরকার। তাতে করে উপকৃত হয়েছে কারা? বেতন খাতেই তো চলে যায় পুরো টাকা। সরকারি কলেজগুলোতে আর কাঠামো খাতে কিছু উন্নয়ন হয়। কিন্তু এখানে মানসম্মত শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেন না কেউ। আর শিক্ষকরা এখন গুরুত্ব দেন 'প্রাইভেট পড়ানোর' ওপর। মানসম্মত শিক্ষা তাদের কাছে মুখ্য নয়। এসব দেখারও যেন কেউ নেই। আজ অর্থমন্ত্রী যখন নতুন বাজেট উপস্থাপন করলেন, তখন এ কথাটাই আবার মনে হল। নিয়ম রক্ষার্থে তিনি শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়িয়েছেন। কিন্তু যে প্রশ্নটি ওঠে, তা হচ্ছে এ বিশাল ব্যয় দিয়ে আমরা উচ্চশিক্ষার কতটুকু মানোন্নয়ন করতে পারব? বাস্তবতা হচ্ছে শিক্ষার মানোন্নয়ন, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষায় গবেষণা, আইটি সেক্টরের উন্নয়ন— এ বরাদ্দ দিয়ে আদৌ সম্ভব নয়। কেননা এ অর্থের ২২ হাজার ১৬২ কোটি টাকা ব্যয় হবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পেছনে। আর ২৬ হাজার ৮৪৭ কোটি (নির্দিষ্ট) টাকা ব্যয় হবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পেছনে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য যে বরাদ্দ, তাতে করে আমাদের উৎফুল্ল হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা এ টাকার খুব সামান্যই ব্যয় হয় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে। শিক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের একটা অংশের বরাদ্দ থাকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য। ২০০১-০২ সালে এর পরিমাণ ছিল ২৯৩.৫৭ কোটি টাকা, আর ২০১০-১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১১০২.২৪ কোটি টাকা। জাতীয় বাজেটের মাত্র ০.৭৫ ভাগ বরাদ্দ থাকে শিক্ষা খাতে (২০০১-০২)। এ পরিসংখ্যান বেড়েছে ০.৮৪ ভাগ ২০১০-১১ সালে। আবার যদি শুধু শিক্ষা খাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বরাদ্দের দিকে তাকানো যায়, তাহলে দেখা যাবে এ বরাদ্দ মাত্র ৭.৮৫ ভাগ (২০০১-০২) থেকে ৮.২২ ভাগ (২০১০-১১)। আগামী অর্থবছরে এ হার খুব বেড়েছে তা নয়। পরিসংখ্যানই বলে দেয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে বরাদ্দ দেয়া হয়, তার পরিমাণ খুব বেশি নয়। সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে, বেড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও। যদিও তুলনামূলক বিচারে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের পরিমাণ খুবই কম। তারপরও কথা থেকে যায়। রাষ্ট্রের পক্ষে এর চেয়ে বেশি বরাদ্দ দেয়া সম্ভব নয়। এখন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ভেবে দেখতে হবে কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আয় বাড়ানো যায় এবং সরকারের ওপর পূর্ণ নির্ভরশীলতা কমানো যায়। এখানে আরও একটা বিষয় বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন— আর তা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়, তার খুব কম অংশই ব্যয় হয় গবেষণার কাজে। বরাদ্দকৃত টাকার একটি সিংহ ভাগ চলে যায় শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বাবদ। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ভিসি মহোদয়রা উন্নয়ন খাতে কিংবা গবেষণায় যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, সে টাকা নতুন শিক্ষকদের বেতন দিতে ব্যয় করেছেন। প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি দলীয় কোটায়, স্থানীয় কোটায় অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন। কিছুদিন আগে একটি জাতীয় দৈনিক বেশ কয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগের ওপর একটি প্রতিবেদন ছেপেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন পরিণত হয়েছে পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে। রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি নিজের মেয়ে, ভাই, আপন ভায়রা, শ্যালিকার মেয়ে, ভাইয়ের মেয়ে, বোনের মেয়েকে শিক্ষক তথা কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিয়ে একটা রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন। এ প্রবণতা প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই আছে। অভিযোগ আছে জাহাঙ্গীরনগরও ইতিমধ্যে একটি পারিবারিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বাজেট ঘাটতির সম্মুখীন হচ্ছে। উন্নয়ন বাজেট থেকে টাকা এনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন দেয়া হচ্ছে। প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই বিজ্ঞাপিত পদের বিপরীতে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মতো বিষয়ে বিজ্ঞাপিত পদের (প্রভাষক) বিপরীতে প্রায় দ্বিগুণ শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল। অতীতে এমনটি কখনোই হয়নি। শুধু তাই নয়, শুধু 'ব্যক্তিগত পছন্দের' ব্যক্তিদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার জন্য একাধিক বিভাগ ভেঙে নতুন নতুন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে, যার আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিল না। অনেক শিক্ষককে জিজ্ঞেস করলে তারা বলতে পারবেন না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন বিভাগের সংখ্যা কত। ফলে সঙ্গত কারণেই যে প্রশ্নটি ওঠে, তা হচ্ছে নতুন করে সৃষ্টি করা বিভাগগুলো কি আদৌ দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে পারবে? প্রসঙ্গক্রমেই আরও একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। তা হচ্ছে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার ফলে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় এক ধরনের বৈষম্য তৈরি হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটের সঙ্গে পটুয়াখালী কিংবা গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটরা কি সমমান সম্পন্ন? আমি কাউকে ছোট করতে চাই না। কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যোগ্য শিক্ষক নেই। সেদিন একটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখলাম। পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইভিনিং বা সান্ধ্যকালীন এমবিএ কোর্সের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি। সান্ধ্যকালীন কোর্স, তাও আবার এমবিএ? কারা পড়াবেন? কে পড়বেন? এর কি আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিল? ওই বিশ্ববিদ্যালয়টি তো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ওখানে তো বিজ্ঞান, আইটি সংক্রান্ত কোর্স চালু থাকবে। বিবিএর বিষয়টি কি আইন অনুমোদন করে? আরও দুটি দৃষ্টান্ত দিই : এক. গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ চালু করা হয়েছে। আমি অবাক হয়ে যাই ওখানে কারা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পড়াবেন? আমরা কি যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ দিতে পারব সেখানে? যারা শিক্ষক নিয়োগ কমিটিতে আছেন, তাদের আমি চিনি। কাউকে ছোট করা নয়, বরং বিবেচনায় নেয়া উচিত আমাদের আদৌ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ গণবিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করা উচিত কিনা। মঞ্জুরি কমিশন নিশ্চয়ই অনুমতি দিয়েছে। এখানে মঞ্জুরি কমিশন বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেনি। দুই. গণবিশ্ববিদ্যালয় একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এখানেও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে! বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক! কে হাজার টাকা মাসে বেতন দিয়ে ওখানে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পড়বে? ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তার বিচক্ষণতাকে আমি সমর্থন করতে পারলাম না। সবাই সার্টিফিকেটসর্বস্ব বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করছে। কিন্তু ডা. জাফরুল্লা চৌধুরী কেন করবেন? এ ক্ষেত্রে অবশ্য মঞ্জুরি কমিশনকে ধন্যবাদ দিতে হয়। মঞ্জুরি কমিশন চায়নি গণবিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে শুধু সার্টিফিকেট বিক্রি করুক। ওখানে সরকার ও রাজনীতি বিভাগ আছে। প্রয়োজনে ওই বিভাগের কোর্সের আওতায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পড়ানো যায়। আমি বিনে পয়সায় ওখানে ছাত্রদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পড়াতে রাজি আছি— শুধু ছাত্রদের আপডেট রাখার জন্য। আমি অনুরোধ করব যারা মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য পদে আছেন, তারা যেন সর্বত্র গণহারে বিভিন্ন বিভাগ খোলার অনুমতি না দেন। শুধু রাজনৈতিক বিবেচনায় বিভাগ খুললে, তা দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে পারবে না।

কয়েকদিন আগে একটি জাতীয় দৈনিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহারে পিএইচডি ডিগ্রি দেয়া নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ওখানে আমার নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের নামও আছে। এর সত্যতা আছে। লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়। কীভাবে লাইব্রেরি ওয়ার্ক না করে, ফিল্ড সার্ভে না করে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করা সম্ভব? যারা করছেন, তারা কি এটা বোঝেন না? যে বিভাগে মাত্র একজন অধ্যাপক, ডক্টরেট ডিগ্রিধারী শিক্ষক নেই, সেই বিভাগে উচ্চতর শিক্ষা কমিটি গঠিত হয় কীভাবে? সংবাদপত্রে যে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে পিএইচডি ডিগ্রি দেয়ার অভিযোগটি উঠেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত, এ ব্যাপারে তদন্ত করে দেখা। না হলে সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে মানুষ হাসাহাসি করবে। সেনাবাহিনীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালসও পিএইচডি ডিগ্রি দিচ্ছে! অথচ তাদের আদৌ সিনিয়র শিক্ষক নেই। ফুল টাইম সিনিয়র শিক্ষক ছাড়া পিএইচডি ডিগ্রি দেয়া কতটুকু নীতিমালার মধ্যে পড়ে, আমি বুঝতে অক্ষম। মঞ্জুরি কমিশন অনুমোদন দিল কীভাবে? সেনাবাহিনীকে নিয়ে আমাদের অনেক গর্ব। উর্ধ্বতন সেনা অফিসারদের যোগ্যতা ও মেধা নিয়ে আমার কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু তারা যদি একটি ভুল করেন, আমাদের তা কষ্ট দেয়। আমি জানি এ বিশ্ববিদ্যালয়টি আগামীতে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। কিন্তু এখানে দরকার যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক। অনেক শিক্ষক আছেন, যারা অবসর নিয়েছেন; কিন্তু কর্মক্ষম, তাদের বিশেষ বিবেচনায় নিয়োগ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি তাদের পিএইচডি কার্যক্রম অব্যাহত রাখুক, এ অনুরোধ রাখব। এ প্রশ্নগুলো এলো এ কারণে, সরকার উচ্চশিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়িয়েছে। এ ব্যয় বরাদ্দ যদি শুধু বেতন খাতেই চলে যায়, তাহলে তো উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিত করা যাবে না। তাই সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এখনই। শিক্ষামন্ত্রী একটু সিরিয়াস হোন। মঞ্জুরি কমিশন তার কর্মতৎপরতা বাড়াক। আমরা একটি দক্ষ শিক্ষিত জনবল গড়ে তুলি, এটাই আমার প্রত্যাশা।

কয়েকদিন আগে একটি জাতীয় দৈনিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহারে পিএইচডি ডিগ্রি দেয়া নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ওখানে আমার নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের নামও আছে। এর সত্যতা আছে। লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়। কীভাবে লাইব্রেরি ওয়ার্ক না করে, ফিল্ড সার্ভে না করে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করা সম্ভব? যারা করছেন, তারা কি এটা বোঝেন না? যে বিভাগে মাত্র একজন অধ্যাপক, ডক্টরেট ডিগ্রিধারি শিক্ষক নেই, সেই বিভাগে উচ্চতর শিক্ষা কমিটি গঠিত হয় কীভাবে? সংবাদপত্রে যে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে পিএচডি ডিগ্রি দেয়ার অভিযোগটি উঠেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত, এ ব্যাপারে তদন্ত করে দেখা। না হলে সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে মানুষ হাসাহাসি করবে।

ড. তারেক শামসুর রেহমান : *বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক সদস্য; অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*
tsrahmanbd@yahoo.com